Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 96 –102
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

শরৎ সাহিত্যে কাশী

Kashi in the Writings of Saratchandra Chottopadhyay

জুয়েল সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sarkarjuel921@gmail.com

Keyword
Kashi, Sarat Chandra Chottopadhyay, Widowhood, Ashram, Traditional Beliefs, Outcast, Abandonment, Pilgrimage.

Abstract
Kashi is attributed as the cultural capital of India. From time immemorial, the Bengali community share a soulful relationship with this holy city situated beside the Ganges. It is one of the few cities of the world having more than one name, that is Kashi, Banaras and Varanasi. It is not only sacred to the Shaiba, Sakta, Vaishnab sects of the Hindu religious community but also holy to the Jain and Buddhist faith. Sarnath located near this city is regarded as one of the holy sites by the Buddhists. One will find *the reference of Kashi* in Bengali literature for a long period of time. Kashi have been the theme and setting in the writings of Bankim Chandra Chattopadhyay, Rabindranath Thakur, Sarat Chandra Chattopadhyay, Prabhat Kumar Mukhopadhyay, Bibhuti Bhushan Bandyopadhyay, Ashapurna Debi etc. We find the appearance of Sarat Chandra Chattopadhyay in the literary scene in the first half of twentieth century. The society then was full of rituals such as polygamy and child marriage which compelled women to become widows at a very young age. Moreover, it was highly difficult for the women folk to remarry which is why they lived a secluded life in the Ashrams and Dharamshalas of Kashi. A section of these widows followed prostitution. It can also be observed that few early aged widows used to leave their houses and used to elope with their lover. The very same widows used to come to Kashi in order to shed their sins after they used to be rejected by their lovers. Apart from these instances, women both widowed and married used to live their remaining life in Kashi to attain salvation. Sarat Chandra Chattopadhyay illustrated these women and their stories in his novels and short stories with acute sympathy. With time our society evolved. Today a widow does not require to live in Kashi but the Mutts and Ashrams exists still. These institutions of Ashrams and widowhouses carry the legacies of Bengali diaspora. Even today Kashi is highlighted as a centre for education, spiritualism and tourism in Bangla literature.

Discussion

ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থল কাশী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেই কাশীকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে কাশীকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না, হয়তো সে সময় কাশীতে বসবাসরত বাঙালীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, অথবা তাঁরা কাশীকে নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রেরণা অনুভব করেনি। ফলে প্রাচীন সাহিত্যে কাশীর উল্লেখ তেমন ভাবে নেই। মধ্য যুগের সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলীতেও কাশীর কথা তেমন ভাবে নেই, কাশীর কথা রয়েছে অন্নদামঙ্গলে সেখানেও পরিপূর্ণ আকারে নয়, পার্বতীর অপর নাম অন্নদা। অন্নদামঙ্গলে দেখা যায় শিব ভিক্ষা করতে গিয়ে ভিক্ষা না পেয়ে ফিরে আসে, তখন শিব জানতে পারে কাশীতে বাস করে এক মহিলা, সে ভিক্ষা দিলে তার সংকট সমাধান হবে। শিব ভিক্ষা নেওয়ার পর বুঝতে পারে সে সাধারণ মহিলা নন তিনি দেবী অন্নদা। এখানে কাশীর উল্লেখ লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনির সংমিশ্রণে ঘটেছে। এরপর অন্নপূর্ণার সঙ্গে বাঙালির একটি সংযোগ স্থাপিত হয়। বাঙালির সাধারণ প্রত্যাশা হল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। তাই অন্নদাকে তারা নিজের করে নিয়েছেন। ধীরে ধীরে বাঙালির সংখ্যা কাশীতে বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনায় এই প্রবাসী বাঙালীরা স্থান পায়।

ভারতবর্ষের একমাত্র শহর বারাণসী, যার একাধিক নাম রয়েছে। এগুলি হল কাশী, বেনারস, বারাণসী। কাশী সংস্কৃতির পীঠস্থানের পাশাপাশি ধর্মীয় পীঠস্থানও বটে। কাশী হিন্দু ধর্মের শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব মতের পাশাপাশি জৈন ধর্মের ও বৌদ্ধ ধর্মেরও অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। জৈন ধর্মের তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জন্ম এই কাশীতেই, এখানে উল্লেখযোগ্য জৈন মন্দিরও রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ পঞ্চবৃক্ষকে প্রথম মন্ত্র প্রদান করেছে এই কাশীতেই। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের যতগুলি পীঠস্থানের কথা বলেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল কাশীর সারনাথ, অপর গুলি হল লুম্বিনী, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মেও কাশী তথা সারনাথের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার তাত্ত্বিক বৈষ্ণবীয় সন্তদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশী, সন্ত রবি দাসের আশ্রম রয়েছে কাশীতে যিনি রামানন্দের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। আবার শাক্তদের তন্ত্র সাধনার অন্যতম প্রাচীন পীঠস্থান কাশী। মণিকর্ণিকা ঘাট একান্ন পীঠের একটি পীঠ। সতীর কর্ণিকা এখানেই পড়েছিল, এটি সতীপীঠ ও তন্ত্র সাধনারও একটি জায়গা ও প্রাচীন দেব-দেবীর অনেক মন্দির এখানে পরিলক্ষিত হয়। তাই কাশীকে শাক্ত ধর্মেরও অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে গন্য করা হয়। শৈব ধর্মের একাধিক পুরনো মন্দির এখানে রয়েছে। এছাড়া সৌর ও বৃহস্পতির মন্দিরও কাশীর শোভাবর্ধন করেছে।

শরৎ সাহিত্যে কাশী: বাংলা সাহিত্যে কাশী বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় 'কাশী' গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফলস্বরূপ নারীরা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে যেত। এই সমস্ত বিধবা নারীরা সামাজিক বিধি নিষেধের ফলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারে প্রবেশ লাভ করতে পারত না। বেশির ভাগ নারীর শেষ জীবনে স্থান হত কাশীতে। এই বিধবাদের অধিকাংশ উচ্চ ও মধ্যবৃত্ত পরিবার থেকে আসত। আবার অনেকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে পুণ্য অর্জনের জন্য স্ব-ইচ্ছায় কাশীবাসী হতেন। বাঙালিদের কাছে কাশী অপর একটি কারণে আকর্ষণীয় ছিল বায়ু পরিবর্তনের স্থান হিসাবে। কাশী বিদেশী ভ্রমণকারীদের কাছেও কৌতুহলের বিষয়, তাই প্রাচীনকাল থেকে বহু বিদেশী নাগরিক কাশীতে ছুটে এসেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধির জন্য। সাহিত্যে সমাজের নানা টানাপোড়েন ফুটে ওঠে, শরৎ সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। শরৎ সাহিত্যে কাশীকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। যুগের দাবীকে মান্যতা দিয়ে যুগযন্তনার ছবিকে তথ্যনিষ্ঠ ভাবে ভাবে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই শিল্পী-সাহিত্যিকদের সার্থকতা। শরৎচন্দ্র সেই যুগের ছবিকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরে বিশেষ যুগধর্মের মহান কর্তব্য সম্পাদনা করেছেন। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি যখন ভাঙনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, সেই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের আখ্যানকে শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীতে তুলে আনলেন। শরৎ সাহিত্যে কাশীকে

কেন্দ্র করে নানা ঘটনার প্রবাহমানতা আমরা লক্ষ্য করি। 'কাশী' অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রের বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

শরৎ সাহিত্যে কাশীর উল্লেখ যে সমস্ত রচনার মধ্যে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) উপন্যাস। কাশী উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা ও বধূ কালীতারা পুত্রের জন্মের পর কাশী বাসিনী হয়ে যান। তিনি সেখানে সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপন করে পুত্রকে মানুষ করতে থাকেন। পুত্র প্রিয়র বিবাহ হয় কুলীন কন্যা জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে, যার বাবা-মা কাশীতে এসে প্রিয়কে ঘরজামাই করে দেশে নিয়ে আসেন। কাশীতে বেড়ে ওঠা প্রিয় মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র গঠনে তার মায়ের প্রভাব এবং কাশীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পড়েছে। তাইতো পরদুঃখ কাতর এই মানুষটি বিনামূল্যে গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করতো। গ্রামের বিরাট নাপিতের দুর্দশার কথা শুনে তার সুদ মুকুব করে দেওয়ার কারণে স্ত্রীর কাছে অপমানিত হলেও গ্রামের অপর দুই ব্যক্তি ত্রৈলক্য ও ষষ্ঠীচরণ তাঁর কাছে সাহায্য পার্থনা করলে তিনি তাদের ফেরাতে পারেননি।

প্রিয়র কন্যা সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হলে কালীতারা কাশী থেকে দেশে আসে, কাশীর শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ধর্মের মানবিক দিকগুলি তিনি বহন করে নিয়ে আসেন। নাতনী সন্ধ্যা যখন প্রচলিত কৌলিন্য প্রথার প্রবাহমানতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে –

> "যে জিনিসটার এত সম্মান-এত দিন ধরে এমন ভাবে চলে আসছে ঠাকুমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভালো?"[১]

কালীতারার উত্তরে তাঁর গভীর জীবন অভিজ্ঞতা, মনন ও চিন্তনের পরিচয় পাই। তিনি বলেন –

> "কিছু একটা দীর্ঘদিন কেবল চলে আসচে বলেই তা ভালো হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সেই মরে।"[২]

উপন্যাসের শেষ দিকে সন্ধ্যার বিবাহ বাসরে তাঁর বাবার জন্ম পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লে বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। কালীতারা পুনরায় কাশীতে স্থান পায়। সন্ধ্যা বাবার হাত ধরে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কালীতারার কুলীন স্বামীর অসভ্য কর্মকাণ্ডে নিরপরাধ কালীতারার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয় ও তাকে কাশী নির্বাসনে যেতে বাধ্য করে। পরবর্তীকালে সন্ধ্যার জীবনেও অন্ধকার নেমে আসে তার ঠাকুমার কুলের দোষের কারণে। এই কুল ত্যাগের কারণে যে সমস্ত মহিলারা সমাজ থেকে নির্বাসিত হত তাদের অধিকাংশরই স্থান হত কাশীতে। কালীতারার মননশীলতার মধ্যে কাশীর ধর্মীয় সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন মঠে ও আশ্রমে বিধবারা যেখানে থাকতো, সেখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি পুঁথিগত শিক্ষাও দেওয়া হত। এ প্রসঙ্গে আমরা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'বকুল কথা' উপন্যাস দুটির কথা বলতে পারি। সত্যবতী সংসার ত্যাগ করে কাশীতে গিয়ে মেয়ে স্কুলের শিক্ষকতা করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে ছিল।

এরপর শরৎসাহিতের উল্লেখযোগ্য ভাবে যে উপন্যাসে কাশীর প্রসঙ্গ এসেছে তা হল 'চন্দ্রনাথ'। এই উপন্যাসের মুখ্য নারী চরিত্র বিধবা সুলোচনা একমাত্র কন্যা সরযূকে নিয়ে কুলত্যাগিনী হয় প্রেমিক রাখাল ভটাচার্যের সঙ্গে। পশ্চিমে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে শেষে তারা কাশীতে বসবাস করতে থাকে। শরৎ সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই কাহিনিতে যখন জটিলতা সৃষ্টি হয় তখন 'কাশীর' আগমন ঘটে ঘটনাকে শৃঙ্খলায়িত করার জন্যে। উপন্যাসে এরপর দেখি সুলোচনা প্রেমিক রাখালদাসের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে হরিদয়াল নামে কাশীর এক বাঙালি পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় নেয় ও রাঁধুনির কাজে নিযুক্ত হন। সুলোচনার কুলত্যাগের পর কাশীতে আশ্রয় নেওয়ার প্রসঙ্গে আমরা 'কাশীবাসিনী' গল্পের মালতীর মায়ের পদস্থলনের পর কাশীবাসের কাহিনি স্মরণ করতে পারি। 'কাশীবাসিনী' গল্পে মালতির মা যেমন মালতিকে বিবাহের পর সুখী দেখতে চেয়েছেন, তেমনি সুলোচনাও তাঁর পদস্থলন গোপন করতে চেয়েছে কন্যা সরযূর ভবিষ্যৎ ভেবে। পরবর্তী কালে দেখা যায় কাহিনির নায়ক চন্দ্রনাথও কাশীতে এসে হরিদয়ালের বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে

থাকে। সুলোচনার দশম বর্ষীয়া কন্যা সরযূ কে চন্দ্রনাথ বিবাহ করে দেশে ফিরে আসে। এরপর চন্দ্রনাথের গৃহে সরযূর মায়ের পদস্থলনের বিবরণ প্রকাশ হয়ে পড়লে, চন্দ্রনাথ সরযূকে ত্যাগ করে। সরযূ আবার কাশীতেই আশ্রয় পায় কৈলাশ নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে। শরৎ সাহিত্যে কাশী যেন নিরাশ্রয় ও বিধবা নারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। হরিদয়ালের মতো অনেক বাঙালি কাশীতে তীর্থের পথ প্রদর্শকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো, যাদের কাছে জাত ও ধর্মই প্রাধান্য পায় মনুষত্বের চেয়ে, তাইতো নিরাশ্রয় সরযূকে তিনি গৃহে স্থান দেননি । আবার কৈলাশচন্দ্রের মতো ব্যক্তিরাও কাশীতে রয়েছে যারা হয়তো নিয়মিত মন্দিরেও যান না বা গঙ্গা স্নানও করেন না কিন্তু বিপদের সময় মানুষের পাশে থাকেন। কৈলাশচন্দ্র অন্তঃস্বত্বা সরযূকে প্রতিপালন করেন নিজের কন্যার মত,সরযূর পুত্র বিশুই হয়ে ওঠে তাঁর বৃদ্ধ জীবনের প্রধান অবলম্বন। দুই বছর পর চন্দ্রনাথ সরযূকে ও বিষুকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কৈলাসচন্দ্র আবার একাকীত্বে ডুবে যান। কাশীতে জন্ম গ্রহণের ফলে তিনি সরযূর পুত্রের নাম বিশ্বেশ্বর রেখেছিলেন, এই বিশুই যখন তাঁর থেকে দূরে চলে গেল, তখন তারও জীবন প্রদীপ নিভে গেলো। 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে বিরহ ও মিলনের প্রধান স্থান হিসাবে কাশী উঠে এসেছে।

'বড়দিদি' উপন্যাসেও 'কাশী' ঘটনার প্রবাহমানতায় সাহায্য করেছে। নায়িকা মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে তার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে কাশীতে চলে যায়। সেখানে মাধবী তার বিধবা ননদিনীর কাছে মাসাধিকাল অতিবাহিত করে ফিরে এলে সুরেন্দ্রনাথ তার কাছে না বুঝে এমন অনুযোগ করে যার ফলে মাধবী সুরেন্দ্রনাথের থেকে দূরে যেতে বাধ্য হয়। আমরা এখানে দেখতে পারছি কাহিনির মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন ঘটাতে 'কাশীকে' নিয়ে আসা হয়েছে। আবার 'পরিণীতা' উপন্যাসে শেখরের মা ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলের মত হয়ে স্বেচ্ছায় কাশীবাসী হয়েছেন মানসিক শান্তি লাভের জন্যে। তিন বছর পর শেখরের বিবাহ উপলক্ষে বাড়িতে এলে, শেখরের কথার ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে অভিমান করে বলেছেন –

> "আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাই না।"[৩]

অর্থাৎ সংসারের জটিলতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে তৎকালীন সময়ে অধিকাংশ বিধবা মহিলারা শেষ জীবন কাশীতে অতিবাহিত করতেন।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের শেষে বিশ্বেশ্বরী কাশীযাত্রা করছেন, সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে উপন্যাসের নায়িকা বিধবা রমাকে। সংসার জীবনের জটিল আবর্তে বিশ্বেশ্বরী ক্ষতবিক্ষত, নিজের পুত্র বেণীর আচরণে লজ্জিত, মানসিক ভাবে বিপযস্ত। তাইতো পরকালের কথা চিন্তা করে সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে কাশী চলেছেন, রমেশের প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বেশ্বরী জানিয়েছেন –

> "এখানে যদি মরি রমেশ, বেনী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হলে তো কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে-জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে পুড়ে, আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ।"[৪]

রমাও রমেশের সঙ্গে বার বার অনিচ্ছআকৃত বিবাদে জড়িয়ে পড়ে মানসিক যাতনা ভোগ করেছে। যে সমাজের বাধা নিষেধের ফলে রমেশের সঙ্গে তাঁর মিলন হল না, সেই সমাজ থেকে সে নিঃশব্দে দুরে চলে গেছে। কাশীতে বাবা বিশ্বনাথের কাছে রমা তার সুখ দুঃখকে সমর্পণ করে বাকী জীবনটা অতিবাহিত করে দিতে চায়। বিশ্বেশ্বরীর কথাতেই এর স্পষ্টতা মেলে –

> "সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্ছি ; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কিনা জানিনে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা-জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এতো গুন, এত বড় একটা প্রান দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা।"[৫]

এখানে ঘটনার পরিসমাপ্তি কাশী যাত্রার মধ্যে দিয়েই শেষ হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার বলেছিলেন যে আপনি আমার কাহিনি গুলি পড়লে দেখতে পারবেন বিধবা সমস্যা মীমাংসা না হওয়ায় কত মহৎ নারী পুরুষের জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেই যে শরৎচন্দ্র একথা বলেছিলেন তা আমরা সহজেই বলতে পারি।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়িকা রাজলক্ষীর পিয়ারী হয়ে ওঠার সূত্রপাত এই কাশী থেকেই। এখানেও সেই কুলীন ব্রাহ্মণের জাত রক্ষার নামে সমাজের নির্মম অনাচারের শিকার রাজলক্ষী ও তার দিদি সুরলক্ষী। যে পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুবোনের বিবাহ হয়, সে বিবাহের দুদিন পরই তাদের ত্যাগ করে বিবাহের যৌতুক সত্তর টাকা নিয়ে নিজের বাড়ি বাঁকুড়ায় চলে যায়। রাজলক্ষীর মা তাদের দুবোনকে নিয়ে যখন পিতৃগৃহে আশ্রয় নেয় তখন রাজলক্ষীর বয়স আট-নয় বছর। বিবাহের তিন বছর পর রাজলক্ষী মায়ের সঙ্গে কাশী গিয়ে আর ফিরে আসে নি। রাজলক্ষীর মা ও মামা রটিয়েছিলেন ওলাওঠা রোগে রাজলক্ষীর মৃত্যুর সংবাদ। আসলে কাশীতে রাজলক্ষীর মৃত্যু ঘটেনি, তার মা এক রাজপুত্রের কাছে তাকে বিক্রি করেছিল। তৎকালীন সময়ে রাজলক্ষীর মতো কত অল্পবয়সী মেয়েরা যে কাশীতে এসে বিপথে গিয়েছে তার হিসেব নেই। এই সব মেয়েদের স্থান হত পতিতালয়ে অথবা কোনো ধনি জমিদারের রক্ষিতা হিসাবে। রাজলক্ষী মনিবের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে পিয়ারী বাইজী হিসাবে সমাজে পরিচিতি পেয়েছে। এই সমস্ত মেয়েরা যে অগাধ সম্পদের মালিক হয়েও মানসিক যন্ত্রনায় ভুগতো তার প্রমান পাই রাজলক্ষীর উক্তিতে-

> "...সেখানে কখখনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুখী।"[৬]

'শ্রীকান্তের' দ্বিতীয় খণ্ডের শেষের দিকে আমরা কাশীতে রাজলক্ষীর বাড়ির প্রথম চিত্র পাই। সেখানে দেখা যায় নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোক দ্বারা রাজলক্ষীর বাড়ী পরিপূর্ণ। এই সব বিধবাদের অনেকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতেই কাশীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। রাজলক্ষীর গুরুদেব অনেকটা মুক্ত চিন্তায় বিশ্বাসী। তাইতো বিপথ গামী নারিদের ধর্ম শিক্ষা দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। আবার লক্ষণীয় বিষয় হল এইসব নারীরা সমাজ বিচ্যুত হলেও ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিল। সাম্পতিক কালে 'ওয়াটার' নামে এক চলচিত্র নির্মিত হয়েছে, যেখানে এই সব অসহায় বিধবা মেয়েদের জীবনকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। রাজলক্ষী শ্রীকান্তের সঙ্গে অভিমান করে যখন তার বিগত পেশায় নিযুক্ত হয়ে অনেকরাতে বাড়ী ফেরে, তখন তার অঙ্গের জড়োয়া অলংকারের চিত্রে কাশীর ভোগ বিলাসের অন্ধকারময় দিকটি আমাদের সামনে উঠে আসে। এখানেই শ্রীকান্তের সঙ্গে সাময়িক বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। এরপর 'শ্রীকান্তের' তৃতীয় খণ্ডের শেষের দিকে কাশীর বাড়ীতে যখন রাজলক্ষীর সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা হয়, তখন রাজলক্ষী পিয়ারী থেকে বঙ্কুর 'মা' হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। তার সেই ভোগ বিলাসের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, শ্রীকান্তের কথাতে তার পরিচয় পাই –

> "... সে শুধু থানকাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠজোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই।...উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি রুক্ষ শীর্ণতা মুখের পরে ফুটিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইল এই একটা মাসেই বয়সেও সে যেন দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।"[৭]

অর্থাৎ 'কাশী' তে যেমন রাজলক্ষী থেকে পিয়ারীর সৃষ্টি হয় তেমনি আবার 'মা' হিসাবেও রাজলক্ষীরও জন্ম হয়। কাশীতে যেন ভোগ ও ত্যাগের সমান্তরাল সহাবস্থান রয়েছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাশীকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। বেশীরভাগ বিধবা নারীদের শেষ জীবনের আশ্রয়ের প্রসঙ্গে কাশীর উল্লেখ এসেছে, আবার কাহিনির বৈচিত্রতা আনতেও কাশীর

অবতারনা করা হয়েছে। অনেক সময় 'কাশী' পরোক্ষ ভাবে কাহিনিতে এসে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে 'দেবদাস' উপন্যাসের কথা বলা যায়। দেবদাসের পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা কাশীতে বাস করতে থাকেন। উপন্যাসের শেষে দেবদাস যখন লাহোরে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ধর্মদাস কাশীতে দেবদাসের মায়ের কাছে খবর দিতে চেয়েছে। কিন্তু দেবদাস মায়ের কাছে তাঁর এই পাপিষ্ঠ মুখ দেখাতে চায়নি। কাশিবাসের ফলে দেবদাসের জননী শুধু গৃহ থেকেই দুরে যাননি, সন্তানের থেকেও দূরে চলে গেছেন। এরপর 'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও দেখি মাতঙ্গিনী ভৈরবীর স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভৈরবীর পদ চলে যায়, তাকে কাশী চলে যেতে হয়। এখানে লেখক মাতঙ্গিনীকে 'কাশী'তে পাঠিয়ে দিয়ে ষোড়শীকে নতুন ভৈরবী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আবার এখানে দেখতে পারছি নিরাশ্রয় বিধবাদের শেষ আশ্রয়স্থল 'কাশী'। 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসেও কাশীর প্রসঙ্গ এসেছে তীর্থ যাত্রার স্থান হিসাবে। দুর্গামণি অতুলের কাছে তীর্থ যাত্রার বিবরণ শুনে আফসোস করেছে, তাঁর একবার 'কাশী' তে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করার বাসনা ছিল। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনে তা কোনোদিন পূরণ হয়নি। বাঙালি হিন্দুদের কাছে কাশী অন্যতম ধর্মীয় স্থান হিসাবেই গুরুত্ব পেয়েছে।

তখনকার দিনে হাওয়া বদলের স্থান হিসাবেও কাশীর পরিচিতি ছিল। 'হরিলক্ষী' গল্পে বেলপুরের জমিদার শিবচরণ বাবুর স্ত্রী হরিলক্ষী হাওয়া বদলের জন্য 'কাশী' যায়। চার মাস পর কাশী থেকে ফিরে এলে তার দেহের সৌন্দর্য গায়ের মেয়েদের গোপন ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাশীর জল বাতাসের গুনে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই ধারনার মধ্যে অত্যুক্তি থাকলেও কাশীতে তৎকালীন সময়ে মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করতো তার পরিচয় পাই বিভিন্ন লেখকদের রচনার মধ্যে দিয়ে। হরিলক্ষ্মী দ্বিতীয়বার এক বছরের জন্যে কাশী গিয়েছেন, লেখক যেন এখানে ইচ্ছে করেই তাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছেন ঘটনার সম্প্রসারণের জন্যে।

'পথ-নির্দেশ' গল্পে হেমনলিনী বিধবা হওয়ার পর গুনেন্দ্রর জীবন থেকে দুরে সরে যেতে কাশী যেতে চেয়েছে। এখানে কাশী বিরহ যাপনের স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে অতৃপ্ত বাসনা যেমন মহৎ প্রেমের প্রান তেমনি প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ। গুণীন্দ্র শেষে হেমনলিনীকে প্রস্তাব করেছে কাশী যাত্রার জন্য। সমাজ তো তাদের সম্পর্ক মেনে নেবে না তাই গুনীন্দ্র জীবনের শেষ সময় হেমনলিনীর সেবা পেতে তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে কাশীকেই উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করেছে। গুনেন্দ্র কথায় তারই স্পষ্টতা পাই –

> "...চল, আজই আমরা কাশী যাই। যে ক'টা দিন আরো আছি, সে ক'টা দিনের শেষ সেবা তোমার ভগবানের আশীর্বাদে অক্ষয় হয়ে তোমাকে সারা-জীবন সুপথে শান্তিতে রাখবে।"[৮]

গল্পের শেষে দেখা যায় তারা যেন জীবনের পথ চলার নির্দেশ পেয়ে গেছে।

'বোঝা' গল্পে কাশী ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী নলিনীর দূরত্ব তৈরি হলে, রামমণি নামে নাপিত বৌ নলিনীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়। কিন্তু নলিনীর শাশুড়ি তার চরিত্রহীন অপবাদ মেনে নিতে পারেননি, তিনি নলিনীকে নিয়ে কাশীবাসী হতে চেয়েছে। সমাজের জটিল আবর্তে নারীরা যখন বার বার লাঞ্ছনা, অপমানের স্বীকার হয়েছে তার থেকে মুক্তি পেতে তারা কাশীকেই আশ্রয় করতে চেয়েছে। দর্পচূর্ণ গল্পে নরেন্দ্রকে জেলে নিলে, নরেন তার মামাতো বোন বিমলাকে খবর দেয়। বিমলা ঐ সময় ছিল কাশীতে ফলে শম্ভু বাবুকে টাকা দিতে না পেরে নরেন্দ্রকে জেলে যেতে হয়। পড়ে বিমলা এসে গয়না বন্ধক দিয়ে নরেন্দ্রকে উদ্ধার করে। এখানে দেখা যাচ্ছে কাশী ঘটনা প্রবাহের ধারা বদলে দিয়েছে।

'পরেশ' গল্পের পরিসমাপ্তিতে আমরা দেখতে পাই পরেশ জ্যাঠামশাই গুরুচরণকে নিয়ে কাশী যাত্রা করছেন। লেখক এখানে সমাজ ও পরিবারের জটিল আবর্তে গুরুচরণ মতো সম্মানীয় অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক পাড়ার বিশ্বকর্মা পুজোর খেমটা নাচের মজলিশে পৌছনোর করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। পরেশ জ্যাঠামশয়ের কাশী যাত্রার ইচ্ছে পূরণ করে তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন।

কাশীতে বাঙালির আগমন দেশ ভাগের আগে ও পরে উভয় সময়েই ঘটেছে। দেশ ভাগের পরে বহু উদ্বাস্তু পরিবার কাশীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে শরণ নেয়। কাশীতে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা বাংলা

স্কুল গড়ে ওঠে, বাংলা পত্রিকা প্রকাশিতও হয়। কাশীর এই বাঙালি অধ্যুষিত স্থানগুলি বাঙালি টোলা নামে পরিচিত, আজও এখানে বাঙালিরা বাস করে। বাঙালির সঙ্গে কাশীর একটি প্রাচীন সম্পর্ক রয়েছে। কাশীর সঙ্গে বাঙালিদের যোগসূত্র বহু প্রাচীন, গঙ্গাতীরের বহু ভবন বাঙালিরা নির্মাণ করেছেন। বর্তমান সময়ে এগুলি সঠিক পরিচর্যার অভাবে বিনষ্ট হতে বসেছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানে কাশীতে বিধবাদের সেভাবে নির্বাসনের পাঠানোর প্রবণতা বাঙালি সমাজে কমে এসেছে, এখন তীর্থ দর্শন করতে স্বইচ্ছায় অনেকে আসেন। তৎকালীন সময়ে কাশীতে যারা এসেছে তাদের অনেকের মধ্যেই মধ্যেই কাশীতে মৃত্যু লাভের পর মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ হবার বাসনা লক্ষ্য করা যায়, এটা মূলত মাইথোলজিকাল ভাবনা থেকে এসেছে। শরৎচন্দ্র যে সময় বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন সেটা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ। সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব তখন গভীর ভাবে লক্ষ্য করা যেত। গ্রামীন সমাজে জমিদারদের শাষন ও শোষণ বিদ্যমান, অপরদিকে সমাজ দলাদলীতে বিভক্ত। সমাজপতিরা অনায়াসেই যে কাউকে জাতিচ্যুত করতে পারতেন। বিধবা সমস্যা সমাধানের তাদের একমাত্র সুলভ পথ ছিল তাদের কাশীতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া। শরৎ সাহিত্যে এই সব নারীদের করুণ বিবরণ তুলে ধরেছেন ও সেই সঙ্গে কাশীর একটি সুন্দর চিত্রও উঠে এসেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নারীদের কথা দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিধবা ও বিপথগামী নারীরা তাঁর সাহিত্যে অন্যতম স্থান করে নিয়েছেন, আর তাদের কথা বলতে গিয়ে 'কাশী'র প্রসঙ্গ বার বার এসেছে তাঁর লেখনীতে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, 'শরৎ রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্যম, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৬৯৪
২. তদেব, পৃ. ৬৯৪
৩. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যম, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৩৬
৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সাহিত্যম, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৮২
৫. তদেব, পৃ. ১৮২
৬. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), সাহিত্যম, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৫৬৭
৭. তদেব, পৃ. ৫৭৩,৫৭৪
৮, তদেব, পৃ. ৮৬৬